ক্ষুধিত পাষাণ : সত্য মিথ্যা কে করেছে ভাগ?

বিভূতিভূষণ বিশ্বাস

'ক্ষুধিত পাষাণ' (১৩০২) গল্পটি কবির মনে প্রথম উদ্ভাসিত হয়েছিল যখন তিনি কিছুদিন আমেদাবাদের শাহীবাগের বাদশাহী আমলের পোড়া রাজবাড়িতে ছিলেন। 'ছেলেবেলা'-গ্রন্থ থেকে জানা যায় ১২৮৫ খ্রিস্টাব্দে যখন সতেরো বছর বয়স তখন বিলেত যাত্রার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ আমেদাবাদে জজীয়তি কর্মে নিযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে কিছুদিন ছিলেন। শাহীবাগ ছিল সত্যেন্দ্রনাথের বাসস্থল। সত্যেন্দ্রনাথ আদালতে যাবার পর রবীন্দ্রনাথ নির্জন শাহীবাগে একা ভ্রমণ করতেন। শাহীবাগের অসংখ্য প্রকোষ্ঠে অন্ধকার অলিন্দে ইচ্ছমতন ঘুরতে ঘুরতে রবীন্দ্র-মনে হাজার বছর পূর্বেকার অতীতের স্মৃতি,আড়াই শো বছরের পুরাতন শাহীবাগের মধ্যে খুঁজে পেলেন।

রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন সতেরো তখন তিনি গেলেন শাহীবাগ প্রাসাদে আর এখান থেকে গল্পের থিম আয়ত্ত করে আরও সতেরো বছর পরে তা মূর্ত করে তুললেন 'ক্ষুধিত পাষাণে'। দীর্ঘকাল ধরে রবীন্দ্রনাথ গল্পটিকে মনে মনেই রূপ দিচ্ছিলেন। গল্পটিকে লেখার একবছর আগে ইন্দিরা দেবীকে সাজাদপুর থেকে একখানি পত্রে যা লিখেছেন তা-ই 'ক্ষুধিত পাষাণের' পূর্বসংকেত।—

> "কেন জানিনে, মনে হয় এই রকম সোনালি-রৌদ্র-ভরা দুপুরবেলা দিয়ে আরব্য উপন্যাস তৈরি হয়েছে—অর্থাৎ সেই পারস্য এবং আরব্য দেশ, দামাস্ক, সমরকন্দ, বুখারা—আঙ্গুরের গুচ্ছ, গোলাপের বন, বুলবুলের গান, সিরাজের মদ, মরুভূমির পথ, উটের সার, ঘোড়সওয়ার পথিক, ঘন খেজুরের ছায়ায় স্বচ্ছ জলের উৎস—নগর মাঝে মাঝে চাঁদোয়া-খাটানো সংকীর্ণ রাজপথ, পথের প্রান্তে পাগড়ি এবং ঢিলে কাপড় পরা দোকানি খরবুজ এবং মেওয়া বিক্রি করছে—পথের ধারে বৃহৎ রাজপ্রাসাদ, ভিতরে ধূপের গন্ধ, জানালার কাছে বৃহৎ তাকিয়া এবং কিংখাপ বিছানো—জরির চটি, ফুলো পায়জামা এবং রঙিন কাঁচাল পরা আমিনা জোবেদি সুফি—পাশে পায়ের কাছে কুণ্ডলায়িত গুড়গুড়ির নল গড়াচ্ছে, দরজার কাছে জমকালো কাপড় পরা কালো হাব্‌শী পাহারা দিচ্ছে—এবং এই রহস্যপূর্ণ অপরিচিত সুদূর দেশে, এই ঐশ্বর্যময় সৌন্দর্যময়, ভয়ভীষণ বিচিত্র প্রাসাদে, মানুষের হাসিকান্না আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কত শত সহস্র রকমের সম্ভব অসম্ভব গল্প তৈরি হচ্ছে।" (ছিন্নপত্র, সাহাজাদপুর ৫ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৪)।

সাজাদপুর রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে আকর্ষণ করত। এর মোহ, এর মায়া—এখানকার বাতাস, সবুজ ডালপালা, পাখির রব, অজস্র ফুলের বিচিত্র গন্ধ কবিকে সর্বদা আচ্ছন্ন করে রাখত। বিশ্বপ্রকৃতি ও মহাজগতের জন্য কবি-মন এতদিন যে ক্ষুধার তাড়নায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল তার আভাসস্থল পেলেন এখানে। এখানে বসে কবির মনে "কত গল্পের ছাঁচ তৈরি হয়ে ওঠে।"

'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পটির শব্দ সংখ্যা প্রায় ৩৭৫০ (সাঁইত্রিশ শ পঞ্চাশ)। গল্পটি প্রকাশিত হয় 'সাধনা'-র শ্রাবণ সংখ্যায় ১৩০২-এ। এর কাহিনী আরব্য উপন্যাসের মতো। গল্পটি 'ফ্যান্টাসি'। এ রোমান্সে ভরপুর। বস্তু ও বিষয়ের দিক দিয়ে রবীন্দ্র গল্পমালায় এর জুড়ি মেলা ভার। গল্পটি যখন লিখেছিলেন তার অল্প কিছুকাল আগে অর্থাৎ ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে ২৮ শে জুন কবি রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> "বসে বসে সাধনার জন্যে একটি গল্প লিখছি। একটু আষাঢ়ে গোছের গল্প। লেখাটা প্রথম আরম্ভ করতে যতটা প্রবল অনিচ্ছা ও বিরক্তি বোধ হচ্ছিল এখন আর সেটা নেই...।"

রবীন্দ্রনাথ কোন গল্প লিখেছিলেন তার কিন্তু নাম করেন নি। তবে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে তিনি 'ক্ষুধিত পাষাণ'ই লিখছিলেন। কারণ "একটু আষাঢ়ে গোছের গল্প" থেকে বোঝা যায়। আর একটি বিষয়ও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ—"লেখাটা প্রথম আরম্ভ করতে যতটা প্রবল অনিচ্ছা ও বিরক্তিবোধ হচ্ছিল"—এর থেকে মনে হয় এই অনিচ্ছাও বিরক্তির কারণ হল কল্পিত কাহিনীর সঙ্গে তাঁর আসন্ন সাজাদপুর কুঠিবাড়ি পরিত্যাগের বেদনা। এই কুঠিবাড়ি রবীন্দ্রনাথের বড়ই প্রিয় নিকেতন। তাঁর গল্প সৃষ্টির জন্ম হয়েছিল এখান থেকে, আর এ চলেছিল প্রবল স্রোতস্বিনী নদীর মতো। শাহীবাগ প্রাসাদের পরিবেশ নির্মিত হয়েছে 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পটিতে। এদিক থেকে এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

'ক্ষুধিত পাষাণ' রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক মনের তৃষিত ক্ষুধার গল্প। নির্জন বরীচের গিরিকুন্ডই, শুস্তা নদীর উপর প্রস্ফুটিত আঁকা বাঁকা পথ, শা-মামুদের ভোগবিলাসের প্রাসাদ, তার স্নানশালা, যুবতী পারসিক রমণীদের স্নানের পূর্বে সেতার বাদন, দাক্ষাবনে গজল গান, দূর থেকে নহবতের আলাপ, নর্তকীর নূপুর নিক্কন—এসবই কবির রোমান্টিক মনের তৃষ্ণার সামগ্রী। কবির রোমান্টিক আতুরতাকে তীব্র থেকে তীব্রতর করে তুলেছে গল্পের নায়িকা। গল্পকথক বলেছে—"সে আমাকে পাগল করিয়া দিয়াছিল। আমি তারই অভিসারে প্রতি রাত্রে নিদ্রার রসাতল রাজ্যে স্বপ্নের জটিল পথ সঙ্কুল মায়াপুরীর মধ্যে গলিতে গলিতে কক্ষে কক্ষে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছি।"

পাষাণপুরীতে বন্দিনী নায়িকা উষ্ণভেজা কণ্ঠে গল্পের কথককে সানুনয়ে মিনতি করে বলেছে—

> "তুমি আমাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাও—কঠিন মায়া, গভীর নিদ্রা, নিষ্ফল স্বপ্নের সমস্ত দ্বার ভাঙিয়া ফেলিয়া তুমি আমাকে ঘোড়ায় তুলিয়া তোমার বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া, বনের ভিতর দিয়া, পাহাড়ের উপর দিয়া, নদী পার হইয়া তোমাদের সূর্যালোকিত ঘরের মধ্যে আমাকে লইয়া যাও। আমাকে উদ্ধার কর।"

মানস অভিসারে সিক্ত 'ক্ষুধিত পাষাণ'। গল্প রচনার তিন বছর আগে 'সোনার তরীর' 'মানস সুন্দরী' করিতা রচনা করেন। 'মানস সুন্দরীকে' কবি খুঁজে চলেছেন গোধূলি-সন্ধ্যা

ও ভোর পথের কনক-দ্যুতিতে সুগন্ধি বসন্ত বায়ুতে, সুপ্ত পূর্ণিমা রাতে অথবা হেমন্তের শেফালি চয়নিকার মাঝে। 'চিত্রা' কাব্যে এসে কবি একেই খুঁজে পেলেন ভিন্ন রূপে—

"অখিল মানস স্বর্গে অনন্তরঙ্গিনী
হে স্বপ্ন সঙ্গিনী।।"

'অনন্তরঙ্গিনী'কে স্বপ্নসঙ্গিনী করে তোলার জন্য কবি হত বা 'নিরুদ্দেশ যাত্রার' অভিসারে লিপ্ত হয়েছিলেন আর এখানেই তিনি প্রশ্ন করেছিলেন—

"আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে
হে সুন্দরী?"

রোমান্টিক ভাববেগের ব্যাকুলতা যেন পাড় খুঁজে পেল গল্পের জগতে। 'মানসসুন্দরী'র অভিসারিকা যেন 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের অভিসারের সঙ্গিনী। 'নিরুদ্দেশ যাত্রার' 'অপরিচতা', 'বিদেশিনী', 'মধুর হাসিনী'র ডাকে সাড়া দিয়ে কবি ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে এসেছেন গল্পের মায়াময় জগতে আর তাই কবি যেন বলতে চান—

'করহ পরশ নিকটে আসি'।

গল্পের প্রাকৃতিক পরিবেশের এমন বিস্ময়কর চিত্র রোমান্টিক ভাবাকলুতার এমন সৌন্দর্যময় রূপ কবি কল্পনার সাথে ছোট গল্পকারের এমন দূরগামীতার পরিচয় বাংলা সাহিত্য ভান্ডার তথা বিশ্বসাহিত্য ভান্ডারের বিরল দৃষ্টান্ত।

শুধুমাত্র ছোটগল্পকার রবীন্দ্র-মননের সাথে কবি-মননের সেতুবন্ধন ঘটেনি, ঘটেছে রবীন্দ্রসঙ্গীতময় জগতেরও। রবীন্দ্র সঙ্গীতের সঙ্গে রবীন্দ্রগল্পের সম্পর্ক বহুজায়গায় বিস্তারিত ভাবে রয়েছে তবে এ সম্পর্কে বিশেষভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের আত্ম-কথন-রীতির গল্পমালাতে। আত্ম-কথন-রীতির গল্প মোটামুটি—

১) 'ঘাটের কথা' (১২৯১)
২) 'মেঘ ও রৌদ্র' (১৩০১)
৩) 'ক্ষুধিত পাষাণ' (১৩০২)
৪) 'বোষ্টমী' (১৩২১)
৫) 'পরীর পরিচয়' (১৩২৯)—

এ সমস্ত গল্পের গল্পকাহিনীর সুরলিপি আমরা পাই গল্পগুলো প্রকাশিত হওয়ার অনেক পরে লেখা গানে। ১৩০২ সালের 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পটির সুরলিপির তাল মেলে ১৩৩০ সালে রচিত একটি গানে—

"যে কেবল পালিয়ে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায়, ডাক দিয়ে যায় ইঙ্গিতে,
সে কি আজ দিল ধরা গন্ধে ভরা বসন্তের এই সঙ্গীতে।
ও কি তার উত্তরীয় অশোকশাখায় উঠল দুলি।
আজি কি পলাশবনে ওই সে বুলায় রঙের তুলি।
ও কি তার চরণ পড়ে তালে তালে মল্লিকার ওই ভঙ্গীতে।।
না গো না, দেয় নি ধরা, হাসির ভরা দীর্ঘশ্বাসে যায় ভেসে

মিছে এই হেলা-দোলায় মনকে ভোলায়, ঢেউ দিয়ে যায় স্বপ্নে সে।
সে বুঝি লুকিয়ে আসে বিচ্ছেদেরই রিক্ত রাতে,
নয়নের আড়ালে তার নিত্য-জাগার আসন পাতে —
ধেয়ানের বর্ণছটায় ব্যথায় রঙে মনকে সে রয় রঙ্গিতে।।"

কল্পলোকের অতীত ইতিহাসকে রোমান্টিক চেতনা দিয়ে রহস্যময় জগৎ সৃষ্টি করে কবি তাঁর কলমের স্পর্শে এমন এক অপ্রাকৃত জগৎ সৃষ্টি করেছেন, পাঠক পর্যন্ত গল্প থেকে এক অনির্বচনীয় ইন্দ্রিয়াতীত সত্তা লাভ করে। নির্জন প্রাসাদে তরুণী ইরানী ক্রীতদাসীর পিছনে তুলার মাশুল কালেকটর সমস্ত রাত্রি ঘুরে বেড়ায়। সে মাঝে মাঝে মনে করে, কে যেন, "আস্তে আস্তে ঠেলিতেছে" আবার কখনও বা আর্শিতে "সেই তরুণী ইরানীর ছায়া আসিয়া" "পলকের মধ্যে গ্রীবা বাঁকাইয়া, তাহার ঘনকৃষ্ণ বিপুল চক্ষু তারকায় সুগভীর আবেগ তীব্র বেদনাপূর্ণ আগ্রহ কটাক্ষপাত করিয়া, সরস সুন্দর বিম্বাধরে একটি অস্ফুট ভাষার আভাসমাত্র দিয়া, লঘু ললিত নৃত্যে আপন যৌবন পুষ্পিত দেহলতাটিকে দ্রুতবেগে" দর্পণে মিলিয়ে যেত। কখনও বা মধ্যাহ্ন রজনীতে বিছানায় বসে একাকী শুনতে পায়—

"কে যেন গুমরিয়া গুমরিয়া বুক ফাটিয়া ফাটিয়া কাঁদিতেছে যেন আমার খাটে নীচে, মেঝের নীচে...কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে 'তুমি আমাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাও—কঠিন মায়া, গভীর নিদ্রা, নিষ্ফল স্বপ্নের সমস্ত দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তুমি আমাকে ঘোড়ায় তুলিয়া তোমার বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া বনের ভিতর দিয়া, পাহাড়ের উপর দিয়া, নদী পার হইয়া তোমাদের সূর্যালোকিত ঘরের মধ্যে আমাকে লইয়া যাও। আমাকে উদ্ধার করো।"

গল্প-নামেই ভীতিপ্রদ বাসনা রঞ্জিত হয়ে আছে। এক পাষাণপুরী সেখানে কোন এক প্রেত-সত্তা ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত হয়ে জীবিত মানুষকে গ্রাস করতে লালায়িত। আফিসের কেরানি করিম খাঁর ভাষায় বলতে পারি—

"এক-সময় ওই প্রাসাদে অনেক অতৃপ্ত বাসনা, অনেক উন্মত্ত সম্ভোগের শিখা আলোড়িত হইত—সেই সকল চিত্তদাহে সেই-সকল নিষ্ফল কামনার অভিশাপে এই প্রাসাদের প্রত্যেক প্রস্তরখন্ড ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত হইয়া আছে, সজীব মানুষ পাইলে তাকে লালায়িত পিশাচীর মতো খাইয়া ফেলিতে চায়।"

এই প্রাসাদের জনশ্রুতি সম্পর্কে জানা যায় দ্বিতীয় শা-মামুদ ভোগবিলাসের জন্য দেড়শত সোপানময় ঘাটের উপরে শ্বেত প্রস্তরে নির্জন প্রাসাদটি নির্মাণ করেছিলেন। এখানকার স্নানাগারের ফোয়ারাগুলিকে গল্প কথক বলেছেন—

"কোনো এক সময় তরুণীরা ফোয়ারার মুখ থেকে উৎক্ষিপ্ত গোলাপগন্ধি জলধারায় স্নান করত, শীকরনিভৃতে গৃহে তারা স্নানের পূর্বে সেতার কোলে নিয়ে দ্রাক্ষাবনে গজল গান করত।"

ইতিহাস আশ্রিত কল্পনা পাঠক মনকে এক ভিন্নধর্মী পরিবেশ জগতে নিয়ে যায়। যেমন—বিজন প্রাসাদের বাদশাহী বিলাস, ইরানী মেয়েদের রূপসৌন্দর্যের কল্পনা, আতরের

গন্ধ, নূপুরের নিক্কন, সেতারের ধ্বনি, নহবতের আলাপচারিতা, প্রহরের ঘণ্টাধ্বনি, সিরাজের মদিরা, কটাক্ষের বিষজ্বালা ইত্যাদি। ইতিহাস আশ্রিত কল্পলোকের গল্পের বক্তা, ফাস্ট ক্লাসের যাত্রী ইংরেজের বন্ধু। গল্পের মধ্যে অবিশ্বাস্য জগৎ জাগতে পারে এই আশঙ্কা করে তিনি শেক্সপীয়রের 'হামলেট' নাটকের বিখ্যাত উক্তিকে কিছুটা পরিবর্তিত করে বলেন—

"There happen more thing in heaven and earth, Haratio, tham are reported in your newspapers."

গল্পের মধ্যে বিভীষিকা সৃষ্টি না হলেও ভৌতিক রস জমে উঠেছে। গল্পের নায়ক পাষাণ পুরীতে তমসাবৃত্ত রজনীতে নেশা জালে জড়িয়ে পড়তো। এই নেশাগ্রস্থ পরিবেশে জড়ানোতেই নায়ক এক বিশেষ ধরনের আনন্দ অনুভব করত। গল্পে টুকরো টুকরো স্বপ্নময় আবেগে যে শিহরণ জাগায় তাতে ঠিক ভয় নয়, কিন্তু বাদশাহী যুগের অতিক্রান্ত জীবনের কাহিনী নিয়ে এতে সৃষ্টি হয়েছে এক রোমাঞ্চকর ভৌতিক পরিবেশ। ইতিহাসসিদ্ধ বাদশাহী জগতের বিচিত্র আলেখ্য দিয়ে গল্প পটভূমি রচিত হলেও মেহের আলীর উক্তিতে বাস্তব সচেতন পরিবেশকে স্মরণ করে দেয়। বাস্তব সচেতনতার উক্তিটি—

'তফাত যাও, তফাত যাও! সব ঝুঁট হ্যায়, সব ঝুঁট হ্যায়।'

দিনের বেলায় কর্মব্যস্ত তুলার মাসুল কালেক্টরভাবে সে অমুকচন্দ্রের জ্যৈষ্ঠপুত্র, তবে রাতের বেলায় 'শত শত বৎসর পূর্বেকার কোনো-এক অলিখিত ইতিহাসের অন্তর্গত' আরেকটি অপূর্ব ব্যক্তি হয়ে উঠতো। আর তাতেই সে অতিপ্রাকৃতের রহস্যপূর্ণ জালে জড়িয়ে পড়তো। এর মিল খুঁজে পাই বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের এ উক্তিতে—

"যখন মনুষ্য হৃদয় কোন উৎকৃষ্টভাবে আচ্ছন্ন হয়, চিন্তার একাগ্রতায় বাহ্যসৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য থাকে না, তখন অনৈসর্গিক পদার্থ ও প্রত্যাশীভূত বলিয়া বোধ হয়। 'কপালকুণ্ডলার' সেই অবস্থা।"

বাস্তব জীবনের সঙ্গে এই অবাস্তবতার সংমিশ্রণে রোমান্টিক কবিদের 'স্বতন্ত্র ধারনের সাধনা সৃষ্টি হয়েছে। Keats-এর 'La Belle Dame Sans Merci' কবিতা সম্পর্কে কোন এক সমালোচক মন্তব্য করেছিলেন—যে মন্তব্যের সঙ্গে 'ক্ষুধিত পাষাণের' সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়—

"It is a master piece of horror stricken reticence and magical suggestion." (Henford—The Age of Words Worth.)

গল্পের কথক পাষাণপুরীতে রাত্রিযাপনের সময় তার চোখের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে আড়াই শ বছর আগেকার এক "রহস্যময় ঘেরা শিহরহণ জাগানো অভিজ্ঞতা।" (সময়ের প্রয়োগরীতি—গোপিকানাথ রায়চৌধুরী) কিন্তু মাশুল কালেক্টরের জীবন তো কেবল রাত্রি নিয়ে নয়—রাতের পরে দিন, দিনের পরে রাত—এই তো চলমান বিশ্বের নিয়ম, আহ্নিক গতির ফলে যেমন দিন রাত্রি ঘুরে ফিরে আসে ঠিক তেমনি গল্পের কথক জীবনে দিনরাত্রি একইভাবে বিদ্যমান। কথক দিনের বেলায় কর্মব্যস্ত মানুষ সন্ধ্যা নামতেই কথকের মধ্যে আর এক বিশেষ অনুভূতি জাগ্রত হয়। একই ব্যক্তি দুটি ভিন্ন সত্তায় পরিব্যপ্ত। তাইতো কথক বলেছে—

"আমার দিনের সহিত রাতের ভারি একটা বিরোধ বাধিয়া গেল। দিনের বেলায় শ্রান্ত, ক্লান্ত দেহে কর্ম করিতে যাইতাম এবং....স্বপ্নময়ী মায়াবিনী রাত্রিকে অভিসম্পাত করিতে থাকিতাম .... সন্ধ্যার পর আমি একটা নেশার জালের মধ্যে বিহ্বলভাবে জড়াইয়া পড়িতাম। শত শত বৎসর পূর্বেকার কোন এক অলিখিত ইতিহাসের অন্তর্গত আর একটা অপূর্ব ব্যক্তি হইয়া উঠিতাম,....।"

মনুষ্য জীবনে দিন ও রাত্রির মতো মাঝে মাঝে বিরোধের সম্ভাবনার জাল সৃষ্টি হয়। ঠিক তেমনি গল্প-কথকেরও। রাতের অন্ধকারে শিহরণ জাগানো বর্ণাঢ্যময় মায়াজালের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে কিন্তু ভোর পথের আলো ফুটতেই পাগল মেহের আলী চিৎকার করে বলেছে—

"সব ঝুঁট হ্যায়, সব ঝুঁট হ্যায়।"

ঘূর্ণমান সময় বিন্যাসের বিচিত্র জটিল জালে রবীন্দ্রনাথ গল্পের বিষয়বস্তুকে সংহত রূপে উপস্থাপিত করার মধ্যে শিল্পনৈপুণ্যে তার প্রকাশ যেন প্রতিপদে ফুটিয়ে তুলেছেন। সৃষ্টি হয়েছে বাস্তব আর অবাস্তব কল্পলোকের সেতুবন্ধন।